সার্ধশতবার্ষিক স্মরণ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

স্বামী বলভদ্রানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''ওর জাম্বুবানের অংশে জন্ম, জ্যোতির্বিদ, ঘরবাড়ি করতে ভালবাসে।... কৃষ্ণের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিল; ও কম নয়।'' ত্রেতা থেকে দ্বাপরযুগ পর্যন্ত জাম্বুবানের বিস্তৃতি। ব্রহ্মার পুত্র তিনি। ভালুক দেহধারী। সুগ্রীবের মন্ত্রী এবং সেই সূত্রে ত্রেতাতারী রামজীর সান্নিধ্যধন্য এবং রাবণ-বধ ও সীতা-উদ্ধারে যুগাবতারের সঙ্গী।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের কাহিনিটি এইরকম : সত্রাজিৎ নামে এক যাদবরাজা কঠোর তপস্যা করে সূর্যের কাছ থেকে স্যমন্তক মণি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতের কাছে এই মণিটি চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি হননি। এর কিছুদিন পরে সত্রাজিতের ভাই প্রসেনজিৎ এই মণিটি ধারণ করে মৃগয়ায় গেলে একটি সিংহ প্রসেনজিৎকে আক্রমণ করে মেরে ফেলে এবং মণিটি নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন জাম্বুবান নিকটবর্তী কোনও গুহায় থাকতেন। তিনি সব জানতে পেরে, সিংহটিকে মেরে মণিটি নিজের কাছে এনে রেখে দেন। এদিকে দ্বারকায় রটে যায়, শ্রীকৃষ্ণই চক্রান্ত করে প্রসেনজিৎকে হত্যা করেছেন মণিটির জন্য, কারণ মণিটি যে তিনি সত্রাজিতের কাছে একসময় চেয়েছিলেন, একথা সকলে জানত। শ্রীকৃষ্ণ এই অপবাদ দূর করার জন্য এবং মণি-হারানোর রহস্য ভেদ করার জন্য ওই জঙ্গলে যান এবং জাম্বুবানের কাছে মণিটি আছে জানতে পারেন। জাম্বুবানের সঙ্গে তাঁর একুশ দিন যুদ্ধ হয়, তারপর জাম্বুবান পরাজিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে মণিটি সমর্পণ করেন। জাম্বুবান জানতে পারেন, তাঁর আরাধ্য শ্রীরামচন্দ্রই দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তিনি ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় রত হন এবং যথাকালে দেহত্যাগ করেন।

জাম্বুবানের অংশজাত বিজ্ঞানানন্দজীকেও যে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কুস্তি লড়তে হয়েছিল সেকথা সর্বজনবিদিত। তখন হরিপ্রসন্ন (বিজ্ঞানানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়) দক্ষিণেশ্বরে আসতে শুরু করেছেন। সেদিন আগত ভক্তরা সদ্য বিদায় নিয়েছেন। ঘরে শুধু হরিপ্রসন্ন আর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন, ''তুই কুস্তি লড়তে পারিস?'' হরিপ্রসন্ন জানালেন যে, পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ''আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? দেখি, লড়তো এক হাত।'' হরিপ্রসন্ন ভাবছেন, ''এ কেমন সাধু দেখতে এলাম—সাধু কুস্তি লড়তে চায়!'' এদিকে ঠাকুরই ততক্ষণে পালোয়ানের মতো

তাল ঠুকতে ঠুকতে কাছে এগিয়ে এসেছেন এবং হরিপ্রসন্নের দুহাত নিজের দুহাত দিয়ে ধরে কুস্তিগীরদের মতোই তাঁকে ঠেলতে শুরু করেছেন। অগত্যা ২০০ ডন ও ২৫০ বৈঠক করা পালোয়ান হরিপ্রসন্নকে এই অসম চ্যালেঞ্জটা নিতেই হল। এবং যা লৌকিক দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত, তাই হল। একটি 'উলটপুরাণ' ঘটল। একাধারে রাম ও কৃষ্ণ হওয়া সত্ত্বেও যুগাবতারকে অনায়াসে ও অচিরে হরিপ্রসন্ন ঠেলতে ঠেলতে দেওয়ালে ঠেসে ধরলেন। ঠাকুরের মুখে তখনও হাসি আর হাতে ধরা হরিপ্রসন্নের হাতের পাঞ্জা দুটি। ওই অবস্থাতেই ঠাকুর তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করলেন এবং সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে হরিপ্রসন্নের শরীর রোমাঞ্চিত হল; প্রায় অবশ হয়ে পড়লেন তিনি। ঠাকুর তখন তাঁর হাতদুটি ছেড়ে তাঁকে যেন মুক্তি দিলেন এবং বললেন, ''কেমন, হারিয়েছিস তো?''

পরবর্তী কালে সাধু ও ভক্তরা বারবার তাঁর কাছে এই ঘটনাটি শুনতে চাইতেন। ঘটনাটি বলে মহারাজ বলতেন, আসলে ঠাকুরই সেদিন জিতেছিলেন। কারণ, যে পরাজিত হয় সে তো বিজেতার দাস হয়ে যায়। হরিপ্রসন্নের শরীর-মন-প্রাণ ও সমগ্র সত্তাটি সেদিন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের চিরদাস হয়ে গিয়েছিল। তাই বিজ্ঞানানন্দজী বলতেন, আসলে শ্রীরামকৃষ্ণই সেদিন জিতেছিলেন।

স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বেলঘরিয়ার উদ্যানে যখন তিনি দশ-এগারো বছরের বালক। শেষ দর্শন ঠাকুরের গলরোগের একেবারে সূচনাকালে—দক্ষিণেশ্বরে ১৮৮৫ সালে যখন তাঁর বয়স ষোলো-সতেরো। এরপরেই তিনি বি এ পড়বার জন্য পাটনার বাঁকিপুরে চলে যান এবং বি এ পাশ করে পুনায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে যান। পুনার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে তিনি পাশ করে বের হন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে এবং ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে গাজিপুরে ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়কার পরিপ্রেক্ষিতে একটি জেলার ইঞ্জিনিয়ার অতি উচ্চ সরকারি পদ। জাম্বুবানের অন্য যে-বৈশিষ্ট্যগুলির কথা শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন (জ্যোতির্বিদ, ঘরবাড়ি করতে ভালবাসে), এইসময় থেকে শুরু করে হরিপ্রসন্ন তথা বিজ্ঞানানন্দজীর পরবর্তী জীবনে সেগুলিও বারবার ফুটে উঠেছে। স্বামী নির্লেপানন্দ তাঁর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, ''তাঁর বাংলায় লেখা 'সূর্যসিদ্ধান্ত' (অঙ্ক এবং জ্যোতিষ সম্মিলিত) আমাদের M.A.-পাঠ্য ছিল। তাঁর 'দেবীভাগবত' তাঁকে অমর করে রেখেছে। নগরবিন্যাস ও পয়ঃপ্রণালী—অত আদিকালে মাতৃভাষায় Engineering কেতাব লেখার তিনি পথিকৃৎ।... তিনি সেকালের B.A., C.E (Roorki) পাশ সিভিল ইনজিনিয়ার।''

হরিপ্রসন্ন কয়েকবার মাত্র ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন এবং দু-একবার দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। প্রথম যেবার দক্ষিণেশ্বরে রাত্রিযাপন করেছিলেন, সারা রাত ঠাকুরকে না ঘুমিয়ে 'মা মা' করে কাটাতে দেখে তাঁর মনে হয়েছিল ''লোকে যে বলে পাগলা বামুন, এতো দেখছি সত্যিই।'' তাই ঠাকুর যেদিন তাঁকে বললেন, ''যে রাম যে কৃষ্ণ, সে-ই এ শরীরে রামকৃষ্ণ'', সেদিন তাঁর একটুও বিশ্বাস হয়নি। বিজ্ঞানানন্দজীর নিজের ভাষায় : ''মনে মনে ভেবেছিলাম, এসব বাজে কথা। তবে এটা ঠিক যে—তিনি একজন সাধু, সজ্জন ও সৎ ব্যক্তি।'' এরপর ঠাকুর একদিন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললেন, ''যখন কৃষ্ণরূপে এসেছিলাম, রাখাল আর গোপীদের সঙ্গে বৃন্দাবনে কত খেলা করেছি।'' সেদিনও ঠাকুরের কথা তাঁর প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু ঠাকুর যেন তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেই, গোপীরা কেমনভাবে তাঁদের মন-প্রাণ-দেহ-আত্মা সর্বস্ব কোনওরকম হিসেব-নিকেশ না রেখেই কৃষ্ণকে সমর্পণ করেছিলেন তা ভাবস্থ হয়ে বলতে

লাগলেন এবং বলতে বলতে যখন সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তখন তিনিও যেন তাঁর জ্যোতির্বলয়ের একটি অন্যতম ভাব হয়ে এক অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। এই প্রথম বিজ্ঞানানন্দজী বুঝলেন, গোপীপ্রেম কী এবং তাঁর সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগ হয় ১৮৮৬-র আগস্ট মাসে। হরিপ্রসন্ন তখন শিক্ষালাভের জন্য বাঁকিপুরে। একদিন দেখলেন শ্রীরামকৃষ্ণ সশরীরে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। পরদিনই 'বসুমতী' পত্রিকায় ঠাকুরের জীবনাবসানের খবর পান।

তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরিতে ঢোকেন ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। চাকরির সূত্রে গাজিপুর ছাড়াও এটোয়া, বুলন্দশহর, মিরাট ও মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি জায়গাতেও তাঁকে বিভিন্ন সময় থাকতে হয়েছে। যখন যেখানেই থাকুন না কেন, এই কয়েকটি বছর তিনি মঠের গুরুভাইদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন এবং মঠের আর্থিক দুরবস্থার কিঞ্চিৎ সুরাহার জন্য প্রতি মাসে ৬০ টাকা করে পাঠাতেন। গুরুভাইরা কেউ কাছাকাছি তপস্যার জন্য রয়েছেন খবর পেলে তিনি তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন এবং অনেক সময় নিজের বাসস্থানে তাঁদের এনে রাখতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া-চিকিৎসার জন্য তিনি মুক্তহস্তে ব্যয় করতেন। এইভাবেই এই পর্বে বারবার তাঁর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে পরিব্রাজনরত স্বামীজী, মহাপুরুষ মহারাজ, অভেদানন্দ মহারাজ ও সুবোধানন্দ মহারাজের সঙ্গে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বৃন্দাবনে বিরজানন্দজী ব্রঙ্কাইটিস ও হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হলে সকলের পরামর্শে তিনি এটোয়ায় হরিপ্রসন্নের কাছে চলে আসেন। হরিপ্রসন্ন তাঁকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করিয়ে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য সেবা করিয়ে একমাসের মধ্যে সুস্থ করে তোলেন। পরে স্বামী প্রেমানন্দজীও হরিপ্রসন্নর এটোয়া-স্থিত বাসস্থানে কিছুদিন আশ্রয় নেন। এই সময়কার অভিজ্ঞতা ও অনুভব স্বল্পবাক্ বিজ্ঞানানন্দজী এইভাবে প্রকাশ করেছেন : ''আমি যখন চাকরি করি তখন ঠাকুরের ত্যাগী ছেলেরা আমার কাছে গেলে আমি তাঁদের কাছে রেখে যত্নাদি করতাম। কেউ অসুস্থ হয়ে আমার কাছে গেলে তাঁদের সমস্ত ব্যবস্থা করতে হত। বেশ আনন্দ হত তাঁদের সঙ্গলাভে।

''পরে গর্ভধারিণী মাকে সাধু হবার জন্য বলে ও তাঁকে অনেক বুঝিয়ে অনুমতি পেলাম। আমি তখন তাঁকে খুশী করবার জন্য একটি থালাতে রূপার টাকা ভর্তি করে সামনে রেখে তাঁকে প্রণাম করলাম। মনে হল, তা দেখে তিনি আনন্দিত হলেন।

''তারপর ধীরে ধীরে সময় বুঝে মঠে চলে আসি। আমার চাকরির সময় স্বামীজীকে সাধু হবার কথা বলি। তখন মঠের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আমি মাসে মাসে টাকা পাঠাতাম। স্বামীজী বললেন, এখন মঠে যোগ দিলে টাকার অভাবে কষ্ট হবে মঠের সকলের। যখন অবস্থা ভাল হবে জানাব। কয়েক বৎসর পর বরাহনগর মঠে চলে আসি ও বাস করতে থাকি।''

এই বিবরণ আমরা পাচ্ছি, 'প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ' গ্রন্থে স্বামী জ্ঞানদানন্দজীর স্মৃতিকথায়। সম্ভবত অনুলিখনে জ্ঞানদানন্দজীর ভুল হয়েছে, কারণ বিজ্ঞানানন্দজী যখন মঠে যোগদান করেন, মঠ তার পাঁচ বছর আগেই—১৮৯২-র ফেব্রুয়ারি মাসে—আলমবাজারে উঠে এসেছে। স্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৯৭-র জানুয়ারিতে, কলকাতায় পদার্পণ করেন ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। হরিপ্রসন্ন এপ্রিল মাসে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আলমবাজার মঠে চলে আসেন। ২০ জুন ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতে স্বামীজী তাঁর সম্বন্ধে সিস্টার নিবেদিতাকে (তখন মার্গারেট নোবল) লিখেছেন, ''যে-সব ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের একজন

একটি জেলার ভারপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ছিল। ভারতের এটি একটি উচ্চপদ। সে খড়কুটোর মতো ঐ পদ ত্যাগ করেছে।"

স্বামীজী ১ মে ১৮৯৭ রামকৃষ্ণ মিশনের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করে ৬ মে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য আলমোড়া যাত্রা করলেন। হরিপ্রসন্ন স্বামীজীর আহ্বানে ১৩ অক্টোবর ১৮৯৭ ব্রহ্মচারী শুদ্ধানন্দের সঙ্গে আম্বালা যাত্রা করে স্বামীজীর সঙ্গে রাজপুতানা ও উত্তরভারতের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেছিলেন। স্বামীজীর তাঁকে আম্বালায় আমন্ত্রণ করার কারণ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখে শ্রীনগর থেকে লেখা চিঠিতে আছে : ''ব্রহ্মচারী হরিপ্রসন্ন যদি আসতে পারে তো ভাল হয়। মিঃ সেভিয়ার একটা স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।" আমরা জানি, আজ হিমালয়ের যে-মায়াবতী আশ্রম তা স্বামীজীর স্বপ্নসম্ভূত। পাশ্চাত্যে থাকাকালীনই স্বামীজীর মাথায় এসেছিল, ভারতে যদি হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে একটি অদ্বৈতচর্চার কেন্দ্র হয়! স্বামীজীর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই সেভিয়ার দম্পতি স্বামীজীর সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তাঁদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কিছুটা পরিচয় স্বামীজীর এই চিঠিতে পাওয়া যাচ্ছে। স্বামীজী লিখছেন, ''মিঃ সেভিয়ার একটা স্থানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন—যা হয় একটা শীঘ্র করে ফেলতে পারলে ভাল হয়। হরিপ্রসন্ন ইঞ্জিনিয়ার মানুষ, ঝট করে একটা করতে পারবে। আর জায়গা-টায়গা সে ব্যক্তি বোঝেও ভাল।... হরিপ্রসন্নকে অতএব একদম আম্বালায় শ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, মেডিক্যাল হল, আম্বালা ক্যান্টনমেন্ট-এ পাঠাবে পত্রপাঠ। আমি পাঞ্জাবে নেমেই সেভিয়ারকে তার সঙ্গে দিয়ে পাঠাব।"

১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৭ তারিখের চিঠিতেও তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দকে ওই বিষয়ে লিখেছেন, ''আমার এই চিঠি পাইবার পূর্বেই হরিপ্রসন্ন বোধহয় আম্বালায় পৌঁছিবে। আমি তাহাদিগকে ঠিক ঠিক advice সেখানে পাঠাইব।... ক্যাপ্টেন সেভিয়ার বলিতেছেন যে, তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন।... তাঁর ইচ্ছা যে, মঠ হতে দু-তিন জন এসে জায়গা select করে। তাদের মনোনীত হলেই তিনি মরী হতে গিয়ে খরিদ করে একদম বিল্ডিং শুরু করবেন। খরচ অবশ্য তিনিই পাঠাবেন। আমার selection তো এক আমাদের ইঞ্জিনিয়ার (অর্থাৎ হরিপ্রসন্ন)। বাকি আর যে যে এ-বিষয়ে বোঝে—পাঠাবে।" পছন্দমতো জমি সেসময় পাওয়া যায়নি এবং ১৮৯৯-র ১৯ মার্চ-এর আগে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়নি। কিন্তু স্বামীজীর কতটা আস্থা ও ভরসার স্থল ছিলেন বিজ্ঞানানন্দজী, দুটো পত্রাংশে আমরা তার প্রমাণ পেলাম।

আলমবাজার থেকে মঠ নীলাম্বরবাবুর বাগানে স্থানান্তরিত হয় ১৮৯৮-র ফেব্রুয়ারি মাসে। এই স্থানান্তরের পেছনে দুটি প্রধান কারণ ছিল। প্রথমত আলমবাজার মঠটির পরিবেশ মোটেই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল ছিল না, তার ওপর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন তারিখের প্রবল ভূমিকম্পে

মঠ-বাড়িটি এতই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে, নতুন কোনও বাড়িতে উঠে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। দ্বিতীয়ত বেলুড়ের বর্তমান জমিটি সকলের পছন্দ হয়েছিল ১৮৯৭-র জুলাই মাসেই। শুধু অর্থসংগ্রহের অপেক্ষা ছিল। ওইবছর ডিসেম্বর মাসে হরিপ্রসন্নকে লেখা স্বামী প্রেমানন্দের চিঠিতে আছে : ''মঠের জায়গার বায়না হইবে হইবে হইয়াছে। ওপারের সেই জমি। আপনি এসময়ে থাকিলে মাপ প্রভৃতি অনেক কার্যে আসিবেন। এই জন্য অন্যকে তোষামোদ করিতে হইতেছে। আমাদের ইচ্ছা আপনি শীঘ্রই এখানে আইসেন।''

ভবিষ্যতের স্থায়ী মঠবাড়ির প্রায় সংলগ্ন বলে নীলাম্বরবাবুর বাড়িটি মাসিক ৮০ টাকায় ভাড়া নেওয়া হয়, যাতে বেলুড়ের স্থায়ী মঠের জমিটি কেনা হলে এখান থেকে তার তত্ত্বাবধান করা যায়।

১৮৯৮-এর ৩ ফেব্রুয়ারি ভাবী স্থায়ী মঠের জমি বায়না করা হয়। ১৩ ফেব্রুয়ারি মঠ আলমবাজার থেকে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতে উঠে আসে এবং ৪ মার্চ মিস হেনরিয়েটা মুলারের দেওয়া ৩৯,০০০ টাকায় দুটি বাড়ি সমেত ২২ বিঘা মাপের ওই জমি কেনা হয়। তারপর স্বামীজীর আদেশে হরিপ্রসন্ন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নতুন মঠের জমিকে বাসোপযোগী করার জন্য। জমিতে আগে নৌকো মেরামতের কাজ হত বলে খুবই অসমতল ছিল। অদ্বৈতানন্দজীকে সহায়ক করে হরিপ্রসন্ন মহারাজ প্রথমে জমিকে সমতল করলেন। এর জন্য খরচ হল আরও ৪০০০ টাকা। তারপর তিনি গৃহাদি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কাজের সর্বাঙ্গীণ তত্ত্বাবধানে ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং হরিপ্রসন্ন মহারাজ। বাড়ি-তৈরি সংক্রান্ত কৌশলী পরামর্শ তিনি যাঁর কাছ থেকে নিতেন তিনি হলেন আড়িয়াদহের অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার রায় বাহাদুর পি সি ব্যানার্জি। প্রথমেই হরিপ্রসন্ন মহারাজ একতলা বাড়িটির সংস্কার করলেন এবং আর একটি তলা তার সঙ্গে যুক্ত করলেন। এটিই বর্তমানে 'স্বামীজী-বাড়ি' বলে নির্দিষ্ট এবং এটি সেইসময় তৈরি হল সাধুদের থাকবার জন্য। এই বাড়িটির পেছনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি বিস্তৃত আর-একটি দোতলা বাড়িও তিনি তৈরি করেন। দোতলায় হয় ঠাকুরঘর, ধ্যানঘর ইত্যাদি এবং একতলাটি তৈরি হয় রান্নাঘর, খাবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। এই জন্য তাঁকে জমির মাপ, বাড়ির নকশা, আনুমানিক খরচের পরিমাণ নির্ধারণ (drawing and estimate)—সব নিজের হাতে করতে হত। সারাদিন কাজ করতেন। গল্পগুজবের সময় পেতেন না; তিনি তা কখনও ভালওবাসতেন না। প্রধানত তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রমে মঠ-বাড়ির বাড়িঘর নির্মাণ সম্পূর্ণ হল। নতুন জমিতে রামকৃষ্ণ মঠ স্থানান্তরিত হল ২ জানুয়ারি ১৮৯৯।

এতদিন হরিপ্রসন্ন ব্রহ্মচারী-রূপে থাকলেও সন্ন্যাস নেননি। এবার ঠাকুরঘরে ঠাকুরের প্রতিকৃতির সামনে বিরজাহোম করে আত্ম-সন্ন্যাস নিলেন ১৮৯৯-র ৯ আগস্ট। নাম হল স্বামী বিজ্ঞানানন্দ।

এর পরে স্বামীজী তাঁকে গঙ্গার তীরে পোস্তানির্মাণ ও একটি ঘাট বাঁধানোর কাজ দেন। এই কাজের জন্য সারাক্ষণ রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে গলদঘর্ম হয়ে সব কিছু তত্ত্বাবধান করতে হত। বিশেষ করে ভাঁটার সময়ই বেশি কাজ থাকত—কারণ পাড়ের যে-অংশ সাধারণভাবে জলের নিচে থাকে, সেখানে ভিত নির্মাণ ভাঁটার সময়ই করতে হয়, তাই সেইসময় স্থান ত্যাগ করা চলে না। কাজেই, বিজ্ঞানানন্দজীকে সদা-সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাদিন কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এই সময়কার একটি ঘটনা বিজ্ঞানানন্দজী প্রায়ই বলতেন, যেটির মাধ্যমে তাঁর প্রতি স্বামীজীর বিশেষ স্নেহ ও কৃপা যেমন বোঝা যায়, তেমনই বোঝা যায় স্বামীজীকে তিনি কত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। গ্রীষ্মের দুপুরে একদিন গলদঘর্ম

হয়ে পোস্তা-বাঁধানোর কাজ দেখছেন। ওপরে স্বামীজী তাঁর ঘরে চিকিৎসকের বিধিমতো বরফ দিয়ে দুধ পান করছেন। এমন সময় স্বামীজীর দৃষ্টি পড়ল নিচে, কাজে ব্যস্ত বিজ্ঞানানন্দজীর দিকে। বরফ-দুধের পাত্রটি তখন নিঃশেষিত। তবুও সেই পাত্রটি সেবকের হাতে দিয়ে বললেন, ''পেসনকে গিয়ে দে।'' (স্বামীজী বিজ্ঞানানন্দজীকে 'পেসন' বলে ডাকতেন।) গ্লাসটি পেয়ে হরিপ্রসন্ন মহারাজ দুঃখিত মনে ভাবলেন : ''এই অবস্থায়ও স্বামীজী ব্যঙ্গ করছেন!'' তবুও স্বামীজীর আদেশপালন কর্তব্য ভেবে, যে দু-এক ফোঁটা পানীয় পাত্রের নিচে পড়েছিল, তাই তিনি পান করলেন। এবং কী আশ্চর্য, ওই দু-এক ফোঁটা পানেই তৃষ্ণা দূর হয়ে গেল, শরীর শীতল হয়ে গেল।

মঠের কাজ শেষ হয়ে গেলে স্বামীজীর আদেশে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের শরৎকাল থেকে তিনি তীর্থরাজ প্রয়াগে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। প্রয়াগে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব ও প্রচেষ্টারই ফলশ্রুতি। প্রথমে মুঠিগঞ্জে তাঁর বন্ধু ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদার মহোদয়ের বাড়িতে থাকলেও পরে তিনি শরৎচন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন যুবকের অনুরোধে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত 'ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে' চলে যান। নামে ক্লাব হলেও এটি ছিল আসলে আশ্রমেরই মতো। বিজ্ঞানানন্দজী এখানে ধ্যান-জপ-শাস্ত্রপাঠে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাতেন। রান্না, বাসন ধোয়া, ঘরবাড়ি পরিষ্কার সব নিজের হাতে করতেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতেন। যখন অধ্যয়ন করতেন, তখনও এত তন্ময় হয়ে অধ্যয়ন করতেন যে সময়ের জ্ঞান থাকত না। অপরাহ্নও ধ্যানে কাটাতেন। সন্ধ্যায় দর্শনার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন আর আগন্তুক বালকদের গীতা পড়াতেন। তাঁরই যত্ন ও ভিক্ষালব্ধ অর্থে ক্লাব তখন চলত। বৃথা গল্পগুজবে তিনি সময় নষ্ট করতেন না কিংবা বিনা প্রয়োজনে কারও বাড়িতে যেতেন না। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ী মঠ স্থাপনের জন্য মুঠিগঞ্জে একটি বাড়ি করা হয় এবং তারই সামনে রাস্তার অপর পারে একখণ্ড পতিত জমিও সেবাশ্রম করার জন্য কেনা হয় এবং পরে সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুঠিগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এলাহাবাদে যাওয়ার পর থেকে বিজ্ঞানানন্দজী সেখানেই পাকাপাকিভাবে থাকতেন। কেবল কার্যোপলক্ষ্যে কখনও কখনও মঠে আসতেন। এইভাবে তিনি বাকি জীবনটা প্রয়াগতীর্থেই অধিষ্ঠিত থেকেছেন। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে কাশী সেবাশ্রম, কনখল সেবাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার ঘরবাড়ি নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের দেখাশোনা করতেন।

বেলুড় মঠে স্বামীজীর মন্দির নির্মাণও তাঁর কীর্তি। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আহ্বানে তিনি প্রয়াগ থেকে বেলুড় মঠে এসে ওই দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজে তিনি কী অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন তা প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দের স্মৃতিচারণা থেকে বুঝতে পারি : ''তখন তাঁহার বয়স পঞ্চাশেরও ঊর্ধ্বে, দেহও খুবই স্থূল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও... সকালে চা ও তৎসঙ্গে সামান্য কিছু খাইয়া, কুলি-মজুরেরা কাজে আসিবামাত্রই—বেলা ৮টায় তিনি কার্যস্থলে উপস্থিত হইতেন এবং বেলা ১টা পর্যন্ত, যতক্ষণ মিস্ত্রি ও কুলিরা কাজ করিত ততক্ষণ, নিকটবর্তী দেবদারু বৃক্ষতলে কখনও বা দাঁড়াইয়া কখনও বা বেঞ্চিতে বসিয়া সকল কার্যই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিতেন। ১টায় সকলের কাজ শেষ হইলে তিনি আসিয়া হাত-মুখ ধুইয়া দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া সামান্য একটু বিশ্রাম করিতেন। আবার ২টা হইতে কাজ আরম্ভ হইলেই তিনি বিশ্রাম হইতে উঠিয়া সেখানে

যাইতেন। তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সেও ঐরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আমরা নিজেদের দিকে তাকাইয়া লজ্জায় অধোবদন হইতাম।"

তাঁর জীবনের অবিস্মরণীয় ঘটনা 'বেলুড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পরে ওই মন্দিরে মর্মরমূর্তিতে ঠাকুরপ্রতিষ্ঠা।' ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের শেষকালে স্বামীজীর আহ্বানে যখন তিনি আম্বালা যান, সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতে পরিভ্রমণের সময় তাঁরা দুজন ভারতের স্থাপত্যশিল্পগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবী মন্দির কীরকম হওয়া উচিত সেই বিষয়ে আলোচনা করতেন। পরে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতেও একদিন গঙ্গাতীরে বেড়াতে বেড়াতে স্বামীজী সবিস্তারে বিজ্ঞানানন্দজীকে বলেন, মন্দিরটি কোথায় হবে ও কীভাবে হবে। মন্দিরের বর্ণনা শেষ করে স্বামীজী তাঁকে একটি নকশা তৈরি করতে বলেন, এবং এও বলেন, ''এ দেহটা ততদিন থাকবে না; তবে আমি ওপর থেকে দেখব।" মন্দির প্রতিষ্ঠার পর একবার বিজ্ঞানানন্দজী বলেছিলেন, ''তিনি (স্বামীজী) আমাকে ideas দিয়েছিলেন এবং নক্সা করতে বলেছিলেন। প্রথম নক্সাটি আমি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী করে তাঁকে দেখাই। ঐটি তিনি পছন্দ করলেন না। এইরূপে দুই তিনবার নক্সা করে তাঁকে দেখান হয়। শেষেরটি দেখে তিনি বলেন, অনেকটা হয়েছে। মূলতঃ তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে এই মন্দির নির্মিত।"

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে স্বামী শিবানন্দজী মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু পরে মন্দিরের স্থান কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। বিজ্ঞানানন্দজী ১৯৩৫ সালের গুরুপূর্ণিমার দিন নতুনভাবে নির্দিষ্ট করা স্থানে আবার তাম্রফলক স্থাপন করেন। মন্দিরের কাজ যাতে সুচারুরূপে হয় সেজন্য তিনি সতর্ক ছিলেন। কিন্তু মন্দিরের নির্মাণকাজ যত এগুতে লাগল, ততই দেখা গেল, তিনি যেন বিশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মন্দিরটির সমাপ্তির জন্য। প্রথমে স্থির ছিল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের জগদ্ধাত্রীপূজার দিন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। সেইজন্য তিনি এলাহাবাদ থেকে মঠে চলেও এসেছিলেন। কিন্তু গর্ভমন্দিরের কাজ শেষ না হওয়ায় তিনি অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন, ''তোমরা বাপু বড় দেরি কর। যত শীঘ্র পার প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ করে ফেল, আর বেশী দেরি কোরো না।" আরও বলেছিলেন, ''স্বামীজী মন্দিরের প্ল্যান করেন, কিন্তু মন্দির হয়নি। রাজা মহারাজ চেষ্টা করেন, তিনি করতে পারলেন না। মহাপুরুষ ভিত্তিস্থাপন করেন, তিনি করতে পারলেন না। সবাই একে একে চলে গেলেন। তাই বলছি, যত শীঘ্র পার তোমরা কাজ শেষ করে নাও, দেরি করো না।" ইঙ্গিতটা বুঝে সবাই ঠিক করলেন : নাটমন্দিরের সমাপ্তি পর্যন্ত আর অপেক্ষা করবেন না, গর্ভমন্দির নির্মিত হয়ে গেলেই মন্দিরের উদ্বোধন করা হবে। সেই অনুযায়ী উদ্বোধনের তারিখ ঠিক হল ১৯৩৮-এর ১৪ জানুয়ারি, পৌষ সংক্রান্তির দিন।

প্রতিষ্ঠার দু-দিন আগেই তিনি এলাহাবাদ থেকে মঠে চলে এলেন। প্রতিষ্ঠার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে আত্মারামের কৌটো নামিয়ে আনতে তিনি সেই যে গর্ভমন্দিরে ঢুকলেন, আর বের হন না। পরে সবাই যখন বলল, শুভ মুহূর্ত বয়ে যেতে পারে, তখন তিনি বের হলেন; অস্ফুটস্বরে বললেন, ''কি করব, ছাড়ে না যে!" তারপর আত্মারামের কৌটো নিয়ে তিনি মোটরগাড়িতে উঠলেন এবং নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পৌঁছে 'আত্মারাম'কে নতুন মন্দিরের বেদিতে প্রতিষ্ঠা করলেন। পূজা ও আরতি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজের কক্ষে ফিরে এসে বলেছিলেন, ''স্বামীজীকে বললাম, 'স্বামীজী, আপনি উপর থেকে দেখবেন বলেছিলেন; আজ দেখুন, আপনারই প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর নতুন মন্দিরে

বসেছেন।' তখন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, স্বামীজী, রাখাল মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতি সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন।" তারপর একটু থেমে বললেন, ''এবার আমার কাজ শেষ হল। স্বামীজী আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েছিলেন, সে ভার আজ আমার মাথা থেকে নেমে গেল।" এরপরে তিনি শেষবারের মতো বেলুড় মঠে এসেছিলেন মাস দুয়েক পরে—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উৎসবে। ফিরে গিয়ে মাত্র মাসখানেক পরে—২৫ এপ্রিল ১৯৩৮ তারিখে—তিনি লীলা সংবরণ করেন।

যাঁদের স্তম্ভরূপে নির্বাচন করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁরই রচিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে তাঁর ভাবের ধারক, বাহক ও প্রচারকরূপে মানবকল্যাণে জগতে রেখে গেছেন, তাঁদের অন্যতম সার্থক স্তম্ভ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ। এই সঙ্ঘের প্রাণ আধ্যাত্মিকতা। বিজ্ঞানানন্দজী জীবন্ত আধ্যাত্মিকতা হয়ে এই সঙ্ঘের আধ্যাত্মিকতাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন। রাজা মহারাজ তাঁকে বলেছেন 'গুপ্ত ব্রহ্মজ্ঞানী'। বলেছেন, ''ব্রহ্মজ্ঞান তাঁর মুঠোর ভেতর। আত্মস্থ হয়ে আণ্ডিল হয়ে বসে আছেন, ওঁকে চেনা যায় না।" ভাগবতে আছে : সিদ্ধপুরুষ মহাপণ্ডিত হলেও বালকের মতো ক্রীড়া করেন; সর্ববিষয়ে কুশলী হলেও জড়ের মতো বসে থাকেন; তাঁরা অনেক সময় এমনভাবে কথা বলেন যে, মনে হয় পাগল। বিজ্ঞানানন্দজীর ক্ষেত্রে এগুলি প্রযোজ্য। তাঁর অনেক আচরণই লোকের কাছে উদ্ভট মনে হত। তিনি যে পোশাক পরতেন, তা অত্যন্ত উদ্ভট ছিল—বড় বড় অনেক পকেট। শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতেও মাথায় থাকত কানঢাকা টুপি। এলাহাবাদে তাঁর শয়নের জন্য তিনটি বিছানা প্রস্তুত রাখতে হত। উঠোনের উপরে একটি বিছানা, বারান্দায় আর একটি এবং ঘরের মধ্যে একটি। কতটা গরম পড়েছে আর কতটা গরম তিনি অনুভব করছেন তার উপরে নির্ভর করে এই তিনটি বিছানায় তিনি বিভিন্ন সময়ে শুতেন। বিছানাগুলির স্থান পরিবর্তন নিষিদ্ধ ছিল। বৃষ্টি হলেও উঠোনের বিছানা বা অন্য কোনও বিছানা সরানোর অনুমতি ছিল না। ঘর অগোছালো থাকত। তাকে গুছিয়ে-গাছিয়ে পরিষ্কার করে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। অথচ নিত্য দেব-দেবীর দর্শন পেতেন। তীর্থের দেব-দেবীরা তাঁর কাছে জীবন্ত হয়ে উঠতেন। প্রয়াগে ত্রিবেণী মা কৃপা করে তিন-বেণী-ধারিণী বালিকা মূর্তিতে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন। কাশীর বিশ্বনাথ—সজীব হয়ে রাত্রে তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন। তিনি সেদিন একটি দুর্ঘটনায় পড়ে প্রবল জ্বরাক্রান্ত হয়ে কাশী সেবাশ্রমে শয্যাগত। শিবের শীতলস্পর্শে তিনি অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন। এদিকে বিজ্ঞানমনস্ক তুখোড় মাথা। কিন্তু ট্রেন ছাড়ার পাঁচ-ছ ঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছতেন। বলতেন, ''কী জানি বাপু, কলকব্জার কাণ্ড! হুস্ করে গাড়ি যদি আগেই চলে আসে।"

ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন মেয়েদের কাছ থেকে সতর্ক থাকতে। অক্ষরে অক্ষরে গুরুবাক্য পালন করেছেন তিনি। সারাজীবন মেয়েদের মুখের দিকে তাকাননি। যখন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট, তখন মহিলারা উপদেশ চাইলে, তাদের দিকে পেছন ফিরে বসে প্রণাম নিয়েছেন এবং অতি সংক্ষেপে দু-একটি উপদেশ দিয়ে তাদের বিদেয় দিয়েছেন। মাতৃজাতিকে তা বলে তিনি অশ্রদ্ধা করতেন না। তাঁর ভাব ছিল—গুরু আমাকে যা বলে গেছেন তা পালন করে যাব, কে কী বলে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু শেষ দিকে তাঁর নারী-পুরুষের ভেদ ঠাকুর ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন। গুরুরূপে অপার করুণায় তিনি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শত শত মানুষকে কৃপা করেছেন। তিনি বলতেন, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর শেষ অসুস্থতার সময় তাঁর অপার করুণার ভাবটি তাঁর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

মহাপুরুষ মহারাজ সন্ন্যাস-রোগে আক্রান্ত হয়েছেন শুনে তাঁকে দেখতে এলাহাবাদ থেকে তিনি তখন মঠে এসেছেন। মহাপুরুষ মহারাজের ডান দিকটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছিল। তিন দিন মঠে থেকে বিজ্ঞানানন্দজী যখন মহাপুরুষজীর কাছে বিদায় নিতে গেলেন, মহাপুরুষজী তাঁর সক্রিয় বাম হাতটি বিজ্ঞানানন্দজীর মাথায় রাখলেন। সেই অনুভূতি বিজ্ঞানানন্দজী নিজে ব্যক্ত করেছেন এই ভাষায় : ''সেদিন থেকে মনের ভাব একেবারে বদলে গেল। তাঁর ভাবটা যেন আমার ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন। এখন মনে হচ্ছে, যে পর্যন্ত আমার গায়ে এক ফোঁটা রক্ত থাকবে সে পর্যন্ত যে আসবে তাকেই ঠাকুরের নাম দিয়ে যাব।'' তা-ই করেছেন তিনি। মহাপুরুষজী বলতেন, ''আমি যেন 'মা-গঙ্গা' হয়ে গেছি।'' বিজ্ঞানানন্দজীও তা-ই হয়েছিলেন—বাইরের খোলসটি যতই গম্ভীর ও হেলদোল-হীন মনে হোক না কেন। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পঞ্চদশ সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী আত্মস্থানন্দজীর বিজ্ঞানানন্দজী-সকাশে যাওয়ার কথা। মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন মহাপুরুষজীর কাছেই, কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছনোর আগেই তিনি অপ্রকট হলেন। সবাই বললেন, ''নতুন সঙ্ঘাধ্যক্ষের কাছে যাও—এঁরা সবাই এক।'' গেলেন, প্রচণ্ড হতাশ হলেন : ''আবাহনও নাই, বিসর্জনও নাই—গ্রহণ-অগ্রহণের অতীত—... ভূতের মতন বসে আছেন।'' মন কেঁদে উঠল মহাপুরুষজীর জন্য। রাত্রে সারাক্ষণ দেখলেন দিব্য স্বপ্ন—কখনও ইনি শিবানন্দজী হয়ে যাচ্ছেন, কখনও বা শিবানন্দজী হয়ে যাচ্ছেন ইনি। পরদিন আবার ছুটলেন তাঁর কাছে। ঘরে ঢুকতেই গতকালের ভূতের মতো মানুষটি বলে উঠলেন : ''এসো ভাই, এসো।'' তাঁর চরণেই চিরশরণ নিলেন তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ প্রবহমান শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তি, যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানুষের জাগতিক জীবনকে আধ্যাত্মিকতায় ওতপ্রোত করে দেওয়ার জন্য। বিজ্ঞানানন্দজী গুপ্তযোগীরূপে নীরবে নিজেকে এই শক্তির উপযুক্ত ধারক করেছেন এবং যখনই ঠাকুরের ইচ্ছায় তাঁর পালা এসেছে, গুরুরূপে সেই শক্তিকে ত্যাগী-গৃহী নির্বিশেষে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'রামকৃষ্ণলোক' বলতে তিনি যা বোঝেন তা একবার ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে : ''আমি বলি, কোন লোকে যাচ্ছি না। External কোনও world-এ যাচ্ছি না। ঠাকুরকে সদা-সর্বদা মনে রাখতে পারলে, তাঁকে ক্ষণমাত্র না ভুলে গেলেই তাঁর কাছে থাকা হল। মন যখন সদা-সর্বদাই ঠাকুরের ভাবে ও চিন্তায় ডুবে থাকবে, যখন মুহূর্তের জন্যও বিস্মরণ হবে না, তখন যেখানেই থাকি না কেন, সেই রামকৃষ্ণলোকেই থাকা হল।''

এই রামকৃষ্ণলোকে নিত্য অবস্থান করে বিজ্ঞানানন্দজী সকলের জন্য এই রামকৃষ্ণলোককেই একমাত্র গম্য বলে নির্দেশ করে গেছেন। ✠

সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা), খণ্ড ২

২। সুরেশচন্দ্র দাস ও জ্যোতির্ময় বসু রায় সম্পাদিত ও সংকলিত, *প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিপটে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ* (উদ্বোধন কার্যালয়)

৩। সংকলক স্বামী চেতনানন্দ, *স্বামী বিজ্ঞানানন্দের স্মৃতিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়)

৪। স্বামী প্রভানন্দ, *রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা* (উদ্বোধন কার্যালয়)

৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয়)